অনার্য উৎসজাত দুর্গা ব্র ান্মণ্যতন্ত্রের পরিমার্জনায় দেবী হয়েছেন

সিদ্ধের মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপূজা পুরাণোক্ত পূজা। হিন্দুশাস্ত্রে সাত প্রকার দুর্গাপূজার- পদ্ধতির উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গাপূজা মূলত তিনখানি পুরাণ-অবলম্বনেকরা হয়। এগুলি হল কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণ এবং বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ।
আমরা, যারা জেলা বীরভূমের বোলপুর শহরের আশপাশে বসবাস করি, তারা স্থানীয় সুপুর গ্রামের রাজা সুরথের বিষয়ে স্বল্পবিস্তরজানি। তিনি যে চন্ডী বা দুর্গার পূজা ক'রে কোন এক রাজনৈতিক দুর্গ বা সংকট হ'তে মুক্ত হয়েছিল এমন কথা লিখে গেছেন ঋষি মার্কন্ড, তাঁর 'মার্কন্ডেয় পুরাণ'এ। গৌড়দেশের প্রতিভাধর পণ্ডিত মার্কণ্ড একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন এমন বিশ্বাস করেছেন স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর সম্পাদিত 'দেবীভাগবত'— এর ভূমিকাতে।

বাংলার ইতিহাসে উল্লিখিত পালবংশ 'দেববংশ' বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, কেননা পালরাজগণের প্রত্যেকেই নামের শেষে 'দেব' শব্দ ব্যবহার করতেন। রামপালদেবের সামন্ত নৃপতিদের মধ্যে এক সুরথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর সময়ে বাংলার ইতিহাসে এক নতুনতর রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তা ছিল মাহিষ্য-জনশক্তির বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান। মাহিষ্য-আন্দোলনের নেতা ছিলেন দিব্যক ও ভীম।দিনাজপুর অঞ্চলে দিব্যকের সঙ্গে রামপালদেবের যুদ্ধ হয়। অতিবলশালী মহিষ্যরাজকে পরাভূত করা রামপালদেবের পক্ষে কখনই সম্ভব হত না, যদি সামন্তনৃপতিগণ দলবদ্ধভাবে সামরিক শক্তি দিয়ে তাঁকে সাহায্য না করতেন। এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য নৌশক্তির অধিকারী সুপুরাধিপতি সুরথ রামপালদেবকে বহু রণতরী দান করেছিলেন।

কৈবর্ত্ত্য বিদ্রোহ দমিত হলে পর সন্ধ্যভাষায় দ্ব্যর্থবোধক 'রামচরিত' রচনা করেন। যে-কাব্য পাঠে পালনৃপতি রামপালদেবকে অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র বলে মনে হয়। এই যুদ্ধেরই পটভূমিতে সর্বপ্রথম আজ হ'তে হাজার বৎসর পূর্বে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী বা দুর্গাপূজাপ্রচলিত হয়েছিল। কেননা, তখন রাজার ধর্মই ছিল প্রজার ধর্ম।

সারা ভারতে অন্য কোন প্রদেশে মূর্তি নির্মাণের রূপে মৃত্তিকা ব্যবহারের চলত নাই, যেমনটি আছে এই বাংলায়। অন্যান্য প্রদেশে দেবদেবীর বিগ্রহগুলি কাষ্ঠ বা দা, ধাতু অথবা শিলা বা প্রস্তর যোগে নির্মিত হয়। মৃন্ময়বিগ্রহ দেবার্চনা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি-জাত। 'মার্কন্ডেয় পুরাণে' উল্লেখ আছে, রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি মহামুনি মেধস কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে দ্বৈত উদ্যোগে বাসন্তীচণ্ডীর পূজা করেছিলেন মৃণ্ময়ীমূর্তিতে। পূজা শেষে তাঁরা স্থানীয় স্রোতস্বিনী মধ্যে সেই মৃণ্ময়ীমূর্তি বিসর্জন দেন। এ সব বিচারে সুরথ ও সমাধিকে বাঙ্গালী বলেই প্রতীয়মান হয়।

মর্ত্যলোকে রাজর্ষি সুরথই নাকি প্রথম দুর্গাপূজা বা চণ্ডীপূজা করেছিলেন। মেধসের আশ্রম ছিল বাংলাদেশের চট্টগ্রামের শৈলশিখরে, সে আশ্রমের নাম ছিল পাতালচণ্ডী বা দেবীপাটলা। এখানেই মেধস সুরথ ও সমাধিকে শুনিয়েছেন পূর্বকালে বারংবার বিপত্তিতাড়িত দেবদেবীমুনি ঋষিগণকে দুর্গা কীভাবে রক্ষা করেছিলেন। সুরথের দ্বারা পূজিত হওয়ার পূর্বকালে দেবী চণ্ডীরূপে চণ্ড উপজাতিকে বা চণ্ডাসুরকে, চামুণ্ডারূপে চণ্ড ও মুণ্ডাসুর বা চণ্ড উপজাতির এবং মুণ্ডারিজন গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বলশালী ব্যক্তিদের, শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দৈত্য অর্থাৎ অর্থাৎ সুম্ভ ও নিসুম্ভজনগোষ্ঠীকে, সুন্দ এবং উপসুন্দকে এবং রক্তবীজ ও মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যবর্গই ছিলেন কল্পিত দেবশক্তি। ব্রাহ্মণেতর জাতি এবং উপজাতিগুলির সমষ্টিগত অভ্যুত্থান রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পরিপন্থী হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য মেধা দ্বারা অনুশাসিত রাজশক্তি বারবার ঐ সকল জাতি ও উপজাতিগুলির বিদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। দুর্গা হলেন শক্তির সমবায়িকা মূর্তি। সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর অবধি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সম্মুখে উপস্থিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধাগুলি অধিকতর সহজ ও অমিশ্র থাকায় একা বিষ্ণু, একক রামচন্দ্র অথবা একাকী কৃষ্ণের পক্ষে সেগুলি নিরসন অথবা সমাধান সম্ভব হয়েছিল। বুদ্ধাবতারের আত্মপ্রকাশের কাল অথবা শাস্ত্রীয় কলিযুগের মধ্যভাগ হ'তে ভারতের জনজীবনের ভিন্নতর, জটিলতর সমস্যা ও বিপত্তিগুলি উপস্থিত হয়। এসকল সমস্যা বা সংকটের মোকাবিলা করা একক কোন রাজশক্তির দ্বারা সম্ভব ছিল না। রাম অথবা কৃষ্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায় ও জাতিগুলির প্রতি মমত্ব প্রদর্শন করলেও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধানে তাদের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কিন্তু কলিযুগের চরিত্র ভিন্ন রকম। এযুগ আপন বৈশিষ্ট্য দ্বারাই অনৈক্য অথবা বিচ্ছিন্নতা দূর করে দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সুতরাং এই যুগে অন্ত্যজ জাতি ও উপজাতিগুলির অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য একদিন ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণ অর্থাৎ রাজন্যবর্গ উত্তরভারতে ঐক্য-পূজারী কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে সমবেত হন। এই মুনি অনার্য কাত্যগোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিলেন। কাত্যায়নের পরামর্শে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বণ, উপাধিক দেবতাগণ তাদের শক্তিকে একত্রিত করেন। কাত্যায়নের আশ্রমঅঙ্গন আলোকিত করে এক অপরূপা অতসীপুষ্পবর্ণা তপস্বিনীবেশধারিণী, সালংকারা তেজোময়ী রমণীমূর্তি আর্বিভূতা হন। ইনি ঘোষণা করেন - 'আজি হইতে নাম মোর দেবী কাত্যায়নী।' ইনিই দেবী দুর্গা। ইনিই মাহিষ্য, চণ্ড, মুণ্ড, সুম্ভ, নিসুম্ভ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভকে বিমর্দিত করে ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও রাজন্যবর্গের জাত্যভিমান, ধনগরিমা, ঐর্শ্যমদ ও পূর্বসংস্কারগুলিকে রক্ষা করেছিলেন। কাত্যায়নের কাল নির্ণয়ের একটা সূত্র পাওয়া যায় দেবীকে — 'হিমালয় দিলেন সিংহ' এই বার্তায়। এক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন কোন যুগে হিমালয়ে সিংহের অস্তিত্ব ছিল। এখন তো হিমালয়ের অরণ্যরাজি

সিংহশূন্য।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে — কলৌ সংঘশক্তি। অর্থাৎ দশে মিলে কর্মসম্পাদনের ভাবধারা এই কলিযুগের দান। সপ্তম শতক হ'তে দ্বাদশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ভারতের মুল ভূখণ্ডে বিদেশী যে-জাতিগুলি এসেছিল, তারা দলগতভাবে ততটা শক্তিশালী ছিলনা যতটা ছিল যুদ্ধবাজ মুসলমান শক্তি। সুরথ 'কোলবিধবংসী যবন' অর্থাৎ মুসলমানের দ্বারা হৃতরাজ্য হন দেবীভাগবতে এ কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং সর্বশক্তি সমন্বয় কোন দেবীমূর্তি নির্মাণ ও তদ্বারা অশুভ তথা বিদ্ধশক্তির মর্দন-কল্পনা মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বকালে অনুপস্থিত। এবং কল্পিত সত্যযুগের শেষ এই মুসলমান অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই তা আমরা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ পাঠে স্থিরনিশ্চিত হই।

সুরথের অনেক পরে আর একজন রাজা, যিনি দিনাজপুরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এই চণ্ডী বা দূর্গার পূজা বহুল প্রচার করেন। এঁর নাম ছিল 'দনুজ মর্দন দেব', প্রকৃত নাম গণেশ। ইনি দনুজ অর্থাৎ দানবদের দমনকালে মহিষাসুরমর্দিনীর উপাসনা করেছিলেন। এঁর সময়েই রাজমহল-পাথরে নির্মিত বহু চণ্ডীমূর্তি অবিভক্ত ব াংলার গ্রাম-গ্রামান্তে স্থাপিত হয়েছিল। এই মূর্তিগুলি কালক্রমে শিবাখ্যা, রামেশ্বরী, অপরাজিত ও বিশালাক্ষি নামে পরিচিত হয়। প্রথম মূর্তিতে কেবলমাত্র সিংহবা হিনী মহিষাসুরমর্দিনী দূর্গাকে দেখা যায়। দেবীর সেই চালচিত্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক বা গণেশ অনুপস্থিত।

কৃষ্ণ এসেছিলেন 'ধর্ম সংস্থাপনের জন্য'। শ্রীগীতায় তাঁর আবির্ভাব বিষয়ে তিনি নিজমুখে বলেছেন, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। দূর্গার আবির্ভাব অন্য প্রয়োজন সাধনে। ধর্মসংস্থাপনা নয়, দুষ্কৃতী বা দৈত্যশক্তির মর্দনই তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রধান কারণ। রাজা ও ভূস্বামীগণ সর্বদা শত্রভয়ে কম্পিত। রাজা বা ধনীচরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্য হল যশ, ধন, মান লাভ করা এবং অজাতশত্র হয়ে রাজ্য বা জমিদারী ভোগ করা। তাই ব্রাহ্মণকে মন্ত্র লিখতে হয়- রূপং দেহি যশো দেহি দ্বিযোজহি।

এবং - দেহি সৌভাগ্যম্ আরোগ্যং দেবী পরং পদম্।।
দেবী নিজেও মার্কণ্ডের বকলমে ঘোষণা করেছেন-
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদা অবতীর্যাহং করিষ্যামি অরি সংক্ষয়ম্।।

এই দৈত্য, অসুর বা দানবেরা কোন কোন ক্ষেত্রে বহির্শত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বহির্শত্রুর মোকাবিলার পক্ষে দ্বাদশ শতক হতেই কোন ভারতীয় রাজশক্তি এককভাবে যথেষ্ট ছিল না। তাই সমবেত শক্তিতে তার প্রতিরোধ প্রয়োজন এই চেতনাই দৈবী ভাবোচ্ছ্বাসের উপর কলিযুগের মঙ্গলকর অভিক্ষেপ বলা যায়। রামপালদেব হতে যে চণ্ডীপূজার শু, রাজা গণেশ পর্যন্ত তার একই রূপ, একই চালচিত্র। এই রূপের পরিবর্তন ঘটল যে াড়শ শতকে, দিল্লীর সম্রাট তখন আকবর। তাঁরই অধীনে বাংলার বারজন শক্তিশালী এবং স্বাধীনতাকামী জমিদার ছিলেন। এঁদের মধ্যে কংসনারায়ণের জমিদারী বা রাজত্ব ছিল তাহিরপুরে। কংসনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন বাংলাভাষায় রামায়ণ- রচয়িতা ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ওঝা।

কংসনারায়ণ একবার রাজসূয় যজ্ঞ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সভাপণ্ডিত কৃত্তিবাস রাজার এই ইচ্ছাকে সংযত করতে বললিন এবং উপদেশ দিলেন কলিতে রাজসূয়যজ্ঞ নিষিদ্ধ, তবে রাজা যদি ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদূর্গার পূজা করেন, তাহলেই রাজসূয়যজ্ঞের ফল পাবেন। কৃত্তিবাসের উপদেশ গ্রহণ করলেন কংসনার ায়ণ, শু হল দূর্গার মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণের কাজ। এই সর্বশেষ পর্যায়ের মূর্তিনির্মাণের কালেই দেবীর চালচিত্রে নতুন চারটি মূর্তি সংযোজিত হয়েছিল। এঁরা হলেন ভ ারতীয় হিন্দু সমাজে ভগবান নির্দিষ্ট চারটি বর্ণের প্রতীকী দেবদেবী, -লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ। লক্ষ্মী বৈশ্য সম্প্রদায়ের, সরস্বতী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের, কা র্তিক ক্ষত্রিয় সমাজের এবংগণেশ শূদ্রশক্তি বা গণশক্তির প্রতীক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য-অনার্য শব্দ দুটির মিথ্যাপ্রয়োগে যেমন ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে, তেমনই সুর ও অসুর শব্দ দুটিও অপব্যাখ্যাদোষে দুষিত হয়েছে বারংবার। স্বর্গ বলতে সুরলোককে বোঝান হয়েছে, অসুরদের হীনবুদ্ধি, অমার্জিত চিসম্পন্ন, ক্রুর, ভয়ানক বলা হয়েছে। সমুদ্রমন্থনের পূর্বকালে সুর ও অসুর শব্দ ছিল না। দেবতা ও দৈত্য বা দানব দুটি সম্প্রদায় ছিল। সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত বা সুরা দেবগণ অধিকারবঞ্চিত হওয়ায় পরিচিত হন অসুর আখ্যায়। দেবগণ মদ্যপ, ভ্রষ্টচরিত্র, হীনতেজা। অন্যপক্ষে সংস্কৃতিবান, সুসভ্য ও মার্জিত ছিলেন অসুরেরা। দেবগণ মায়াবী, প্রতারক, ছলনাশ্রয়ী; অসুরগণ বীর, সম্মুখযুদ্ধে সতত আগ্রহী এবং বহুবার দেবলোক বা রাজশক্তিকে পরাস্তকারী। সুতরাং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজ ও সম্প্রদায় রক্ষার প্রয়োজনেই দুর্বলজাতিগুলি রাজ্যাশ্র য়ে একত্রিত হ'য়ে ক্ষমতাবান বিক্ষুব্ধ জাতিগুলির বিদ্ধে লড়াই করেছিল — এটিই দূর্গামূর্তি কল্পনার বাস্তব পটভূমি।
দূর্গাবিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলি বিভিন্ন মন্ত্রে, কথায় বা গানে অভিব্যক্ত। সেগুলি একটু উল্লেখ করা যাক — ১) 'দূর্গা' শব্দের বর্ণনিচয়ের অর্থভেদে 'দূর্গা' ন ামের তাৎপর্য এভাবে ফুটে উঠেছে — দৈত্য নাশার্থং বচনো দ-কার পরিকীর্ত্তিত।
উ-বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ।।
রেফ — রোগঘ্ন বচনো আ-কার পরিকীর্ত্তিত।।
২) প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপতদস্তস্য নশ্যান্তি তমোসূর্যোদয়ে যথা।।
৩) দূর্গে দুর্গতি নাশিনী।
৪) শ্রীদূর্গাস্মরণে সমুদ্রমন্থনে বিষপানে ঝিনাথ মলো না।
৫) তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার লক্ষ অসিঘাতে প্রাণ গেল না।
কথিত আছে সুরথ তাঁর মশানে শিবখ্যার সামনে এক লক্ষ নর হত্যা করেন। এই লক্ষ মৃতমানুষ প্রেতযোনি হ'য়ে সুরথকে তাড়া করলে তিনি প্রাণভয়ে তারা বা দূর্গ ায় স্মরণ করেন। এবং দূর্গার নির্দেশে লক্ষ সংখ্যক ছাগ বলি দিয়ে সুরথ প্রেতভয়মুক্ত হন। নিরীহ একলক্ষ ছাগের প্রাণ দানে, না চণ্ডীর মাহাত্ম্যে সুরথ সংকটমুক্ত হন — যুক্তিবাদীরা এ প্রশ্ন রাখতেই পারেন। শ্রীগীতাতে 'দূর্গ' শব্দে সংকট বুঝান হয়েছে। —

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গানি মৎপ্রাসাদাৎ তরিষ্যসি। মোক্ষযোগ।।
দূর্গা যে সংকটবিনাশিনী তা সে শত্রুনিধন করেই হোক, অথবা পাপভয়দূর করেই হোক অথবা দুর্গামাসুরকে বধ করেই হোক তা বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে।
দেবদেবী উভয়েই মদ্যপান করতেন। মহিষাসুর তিরস্কার করে দেবী বলেছেন — 'গর্জ গর্জ তাবৎ মূঢ় যাবৎ মধু পিবাম্যহম্।' তুমি ততক্ষণ গর্জন কর হে মূর্খ, যতক্ষণ না আমি মধু বা সুরা পান শেষ করছিল। রাজন্যবর্গ মদ্যপ ছিলেন, জমিদারদের আভিজাত্যের অঙ্গছিল পানাসক্তি, মুসলমান নবাব ও জায়গীরদারগণ 'অ াসব' পান করতেন সুতরাং দেবীর মদ্যপান সমাগত রাজন্যবর্গের সুরা পানকেই স্মরণ করায়। দূর্গাপূজার রাজনৈতিক পটভূমি সবিশেষ গুত্বপূর্ণ। একা নয় সংঘশক্তি দ্বারা কার্যসাধনই দূর্গাপূজার মূল অর্থ এবং এটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ বিভক্ত হিন্দুভারতীয়দের সমবেত শক্তিতে চলমান মঙ্গলকর সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রতিচ্ছবি। ধন, বিদ্যা, শক্তি এবং জনবল ছাড়া কোন জাতির বা সমাজের পক্ষে, কোন রাষ্ট্রযন্ত্র বা প্রশাসনিক পরিকাঠামোর পক্ষে উত্থান বা উন্নতি সম্ভব নয়। তাই দূর্গাপূজা এত আদরের, এত সর্বজনসমাদৃত আনন্দোৎসব।

লক্ষণীয় দূর্গা মহিষাসুর মর্দন করেছেন মাত্র, প্রাণে মারেন নাই। প্রজাগণ সর্বদা রাজানুগত্য স্বীকার করবে এটিই রাজার কাম্য। অন্যথায় তাদের ধ্বংস করতে হয়; কিন্তু তা করলেও রাজশক্তি প্রজাহীন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। তাই এরূপ মূর্তি কল্পনা। যুদ্ধাবসানের পর যেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে দূর্গার কাছে ডেকে ত াদের অবস্থান নির্ণয় করে দিয়ে বাঙালী শিল্পী মনোমত মাতৃমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে দৃষ্ট দূর্গাপ্রতিমাগুলি সেইরূপই। না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে সালংকারা সুসজ্জিতা বীণাবাদিনী সরস্বতী অথবা ধনদেবী লক্ষ্মীর উপস্থিতির কারণ কি? লম্বোদরের হাতে গদা, চক্র এবং কার্তিকেয়র হস্তধৃত শরধনু যুদ্ধক্ষেত্রে মানানসই সন্দেহ নাই।
দূর্গাপূজা করলে ব্যক্তি, সমাজ অথবা রাষ্ট্রীয় জীবনের দুর্গতি দূর হয় এই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। এটি একটি কৌশল বা প্রচেষ্টার ছবিমাত্র, এর দ্বারা কোন কল্যাণ হলে বাঙালীর দুর্গতি আজ আকাশছোঁয়া হবে কেন? দূর্গার আত্মপ্রকাশের ক্ষণে দেবগণেরসম্মিলিত তেজ আকাশ স্পর্শ করেছিল, আর সহস্র বর্ষের দূর্গাপূজার পর বাঙালীর সমস্যা ও সংকট গগনসীমা পার হতে চলেছে। আজ অধিকাংশ পারিবারিক দূর্গাপূজা হয় বন্ধ, নয় অত্যন্ত দীন আয়োজনে শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞের মত সমাপ্ত। চারদিকে বারোয়ারী দূর্গাপূজামণ্ডপের সংখ্যা এবং সমারোহ বাড়ছে - সে শুধু পূজাকে নিমিত্ত মাত্র করে ভিন্নমাত্রার আনন্দ আস্বাদনের জন্যই। নিপীড়ন, নির্যাতন, ভয় প্রদর্শনদ্বারা সংগৃহীত হাজার হাজার টাকা অকাজে-কুকাজে ব্যয়িত হয়। বারোয়ারী পূজামণ্ডপে পুরোহিত যখন গঙ্গাজল, আসন, ফুল কিংবা পূজে াপকরণ চাইছেন বার বার - উদ্যোক্তারা তখন প্যাণ্ডেলের চাকচিক্য বৃদ্ধির চিন্তা ও কর্মে নিরত - সেইসব পূজন অপেক্ষা বিসর্জনেই বেশি ব্যয়বরাদ্দ থাকে। কোথাও কোথাও বস্ত্রদান, অন্নদান করা হয়। সে দেবীর মাহাত্ম্য নয়, উদ্যোক্তাদের দেহে ভদ্র রক্তের পরিচায়ক। না হলে দেশের সর্বস্তরে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল রূপটিই আমরা পূজ াশেষে দেখতে পেতাম।

বাঙালী হৃদয়ে দূর্গাপূজাকে এত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করার পিছনে রয়েছে কৃত্তিবাসীরামায়ণের অবদান। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর সংস্কৃত- রামায়ণে রাবণবধার্থে র ামকে দিয়ে অগ্নির উপাসনা করিয়েছেন। কৃত্তিবাসের বাঙালী হৃদয়, বাঙালী মস্তিষ্ক রামকে দিয়ে করিয়েছে দূর্গাপূজা; তাও শরৎকালে বা অপ্রশস্তকালে বা অক ালে।
রাবণস্য বধার্থায় রামস্য অনুগ্রহায় চ
অকালে পূজিতা দেবী;
কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে আর্যকুলতিলক রামচন্দ্রকে এতদ্দেশীয় অনার্যজাতির প্রতিভূ করে তুলেছেন। কেননা আর্যরা মূর্তিপূজা জানতেন না। আমাদের শাস্ত্রে আছে —
অগ্নির্দেবা দ্বিজাতিনাং মুনিনাং হৃদিদৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্বত্র সমদর্শিঃ।।
স্বয়ং বিষ্ণুঅংশজাত রামচন্দ্র প্রতিমা পূজা করে স্বল্পবুদ্ধি এবং অদ্বিজ হতে যাবেন কেন? রাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়, রাবণ ছিলেন ব্রহ্মরাক্ষস। রাম যথার্থই দূর্গাপূজা বিধি জানতেন না; তাঁর সংকল্পপূর্ণ করেছিলেম স্বয়ং দশানন। এত বড় ত্যাগ, নিশ্চিত মৃত্যুকে এভাবে শুচিশুদ্ধ অন্তরে গ্রহণ — অনার্য অসুর রক্ষজাতিকুলোদ্ভূত র াবণে সম্ভব হল কী করে? এখানে তিনি রামচন্দ্রকেও চরিত্রগৌরবে অতিক্রম করেছেন।

এ সবই বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত চরিত্র। বাস্তবে নরাকৃতি কোন অবয়বে কুড়িটি হাত, দশটি মুন্ড, অথবা দশটি হাত, আটটি হাত, চারটি হাত, সহস্রব াহু সংযোজন অসম্ভব। জীববিজ্ঞানে এগুলি অঙ্গবিকৃতিই। যে কারণে রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু, মুহম্মদ, নানক, কবীর বা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস — কারোরই ঐ রকম কোন অসম্ভব অবয়ব ছিল না, এঁরা সকলেই স্বাভাবিক মনুষ্যাবয়বেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কৃত্তিবাস কল্পিত রামচন্দ্র দ্বারা দূর্গার পূজা মাত্র চ ারশ বছরের ঐতিহ্যবাহী, সুরথকে ত্যাগ করে আমরা রামের পূজাকেই গ্রহণ করেছি। মনে রাখতে হবে রামের পূজা অকালে, যিনি এই পূজার গ্রন্থাচার্য হবেন তঁ ারই অশুভ হবে এবং ব্রহ্মরাক্ষস বা দৈত্যপূজিতা চন্ডী বা চামুণ্ডাই হলেন দুর্গা। সুতরাং এ পূজার দ্বারা কল্যাণ অসম্ভব।
এবার দূর্গার অন্যান্য রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর কালকেতু হ'য়ে জন্মে দেবীকে দেখেছিলেন স্বর্ণগোধিকা বা গোসর্প রূপে। মহাভ ারতের বনপর্বে যুদ্ধিষ্ঠির দেখেছিলেন কোকা বা শৃগালীরূপিনী দূর্গাকে, দশটি হাত থাকার জন্য কাঁকড়াকে দূর্গাজ্ঞানে মান্য করা হয়, গাভী হিন্দুর নিকট ভগবতীর মান পেয়ে থাকে; আবার শারদীয় দূর্গাপূজায় নবপত্রিকা তৈরী হয় ন'টি শস্য একত্রে রেখে। এ বিষয়ে পুরাণের নির্দেশ —
রম্ভাকচ্চি হরিদ্রা চ জয়ন্তীবিল্বদাড়িমৌ।
আশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চেতি নবপত্রিকা।।
ইনি আবার গণেশ-পত্নী রূপে কল্পিতা। দূর্গাপূজা ছিল অনার্যজাতির নিকট শাকম্ভরী বা শস্যদেবীর পূজা। দ্রবিড় জাতির সংস্কৃতিতে সিন্ধুসভ্যতার যুগে শাকম্ভরী পূজা প্রচলিত। প্রকৃতিই দূর্গা, রাম শব্দে জীবন-পূজা, যাঁর অঙ্গকান্তি নবদুর্বাদলশ্যাম, শরতে শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের মত। মহাষ্টমীর বলির আগে বা পরে কোন কোন পূজ ামণ্ডপে হোম হয়। এটি অবৈদিক দূর্গাপূজাপদ্ধতির অঙ্গমার্জনা মাত্র। কোথাও কোথাও শঙ্খচিলকে দূর্গা জ্ঞানে মান্য করা হয়। এছাড়াও আছে অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে কুমারী বা গৌরী সম্মানে পূজার বিধি। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় নির্দেশ — অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা রোহিনী।
দশমে কন্যকাপ্রোক্তা অতঃ ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা।।
পূজামণ্ডপের যূপকাষ্ঠে দেবীপূজার জন্য যাদের উৎসর্গ করা হয় তারা হল ছাগ, মহিষ, শস্য মধ্যে ইক্ষু, কুষ্মাণ্ড, শস্যবীজ মধ্যে মাসকলাই সুপারি। এই বলিবিধি ব াঙালী তথা ভারতীয়দের দুর্গতির আর এক কারণ। শাস্ত্রকারগণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যকে দেবীপীঠে বলি দিতে বলেও বিকল্প ব্যবস্থা রূপে তাদের প্রতীক বলি দিতে বললেন কেন? এ এক মোহান্ধ ভ্রান্তিদুষ্ট ধর্মবোধ বলা যায়। ছাগ বলি দিলে কাম, মহিষ বলি দিলে ক্রোধ, মেষ বলি দিলে মোহ, ইক্ষু বলি দিলে

পৌণ্ড্রাসুরকে, মাসকলাই বলি দিয়ে মাৎসর্যকে উৎসর্গ করা হয় — এ এক উদ্ভট ধর্মবুদ্ধি! ফলত শতসহস্র নিরীহ প্রাণী দেবীপীঠে সহস্র বৎসরে প্রাণ হরিয়েছে, বাঙালীর কামাচারিতা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, মোহ দূর হয়নি এতটুকুও। কবিগু তাই দুঃখিতহৃদয়ে লিখেছিলেন — ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে,
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।
এসবই হল এতদ্দেশীয় ধর্মহীন নিম্নবর্গীয় অনার্য বা অসুর দ্রবিড় বা মোঙ্গলয়েড, কিরাত, শবর, ভল্লা প্রভৃতি জাতি বা উপজাতি দ্বারা উদ্ভাবিত মাতৃউপাসনা পদ্ধতির উপর বহুব্যাপী ব্রাহ্মণ ও রাজশক্তির প্রভাব বিস্তারের ফলশ্রুতি। দূর্গাপূজা একদিন অন্ত্যজ মানুষের কাছে অন্য আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যখন অর্বাচীন আর্যসভ্যতা এদেশে আসে নাই। যাগ-যজ্ঞ-হোম-পশুবধ এসব পূজার অঙ্গ হিসাবে তখন ছিল না। পশুপাখীর অনেকগুলিকেই কালকেতু করেছিল অনার্য জাতির মানুষেরা। এদের পূজাই ছিল দেবদেবীর পূজা। যেমন ভয়ানক সিংহ, দৃষ্টিনন্দন শ্বেতহংস, অতিক্রোধী ষণ্ড, সুন্দর ময়ূর, ইঁদুর বা স্থিরবুদ্ধিবলশালী হস্তী, মহিষ, পেঁচক বা উলুক এ সবই আদিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ভাবাদর্শে শুভ বা অশুভ শক্তিরূপে পূজা পেয়েছিল। এরাই ছিল আদিম অনার্য গোষ্ঠীর মানুষের নিকট শক্তি ও মঙ্গলের বাহন। পেঁচা শস্যনষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে, তাই সে লক্ষ্মীর বাহন। ভারতের বনাঞ্চলে হস্তীদেবতার পূজা আজও প্রচলিত আছে। আদিম মানুষ সেই পূজা করত, ব্রাহ্মণ হস্তক্ষেপে তাই হয়েছে গণেশ। হস্তীর স্থিরবুদ্ধি, ধৈর্য্য ও শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাকে করা হয়েছে বিকর্মার বাহন। দূর্গার আর এক নাম বীর্যশুল্ক। অর্থাৎ দূর্গার করুণা পেতে হলে বীর্যকে শুল্ক বা মূল্য হিসাবে দিতে হয়। সংযমে ও বীরত্বে পশুরাজ সিংহই শ্রেষ্ঠ। বার বৎসর অন্তর সিংহ রমণে রত হয়। তাই দুর্গার বাহনরূপে সিংহের সম্মান। তাই রাজাসনে সিংহমূর্তি উৎকীর্ণ করা হত। সে আসনের নামও ছিল সিংহাসন। ক্রুদ্ধ মহিষ ও সিংহের সংগ্রামরত অবস্থাই ছিল দূর্গার চালচিত্রের অঙ্গ।

আসলে শস্য ও সমাজ এতদুভয়ের কল্যাণকরী শক্তি বা বিনাশের স্বভাব যেসব পশুপাখীতে বর্তমান সেগুলিই ভারতীয় প্রাগার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা বহু প্রাচীন কাল হ'তে পূজিত হয়ে আসছে। পরে এইসব পশুপাখীকে বাহন রেখে তাদের উপযোগী দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করেছেন পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ-মুনি বা ঋষিগণ। আর 'ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি' দিতে গিয়ে দেবদেবীদের কেউ হয়েছেন দশভূজা, কেউ চতুর্মুখ, কেউ পঞ্চাননযুক্ত, কেউ চতুর্ভূজা, কেউ কুড়িহাতযুক্ত দশস্কন্ধ, কেউ বা অষ্টভূজা — যেগুলি ধ্যানকল্পনা ছাড়া বাস্তবে অসম্ভব। এবং একান্তই অপ্রয়োজনীয়। ঋষি বঙ্কিমের ভাষায় বা ঋষি অরবিন্দের ধ্যানকল্পনায় দেশজননীই হলেন দশপ্রহরণধারিণী দূর্গা। এ সব অন্য জগতের কথা। মাইক, প্যান্ডেল, চটুলগানের আবিলতাপূর্ণ দেবদেবীর পূজামন্ডপে সেই জগতের কোন খবর নাই।
ইতিহাসের স্কন্দগুপ্ত হুন, তাতার মঙ্গোলীয়দের অনুপ্রবেশ খেছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত। গুপ্তযুগে রচিত স্কন্দপুরাণে তিনিই মায়ুরীক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিপুষ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। তবু এই পূজা কার, কাদের দ্বারা এর সূচনা তা ভাবতে হয় যখন দশমীর দিনে শাবরোৎসব প্রত্যক্ষ করি, যখন দেখি আদিবাসীরা মাথায় ময়ূর পালক গুঁজে পূজামণ্ডপে নাচতে এসেছেন দলে দলে। এঁরাই দেবীমর্দিত মুণ্ডারীজনগোষ্ঠী।

মূলত দ্বাদশ শতকের শু হতে অধূনাদৃষ্ট দূর্গাচেতনার জন্ম — প্রথমে চণ্ডীতে, পরে দূর্গাতে। তৎপূর্বে মাতৃপূজার এমন বিসদৃশ আয়োজন ছিল না। যখন বহির্শত্রুকে বাধা দান জাতীয় কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল তখনই চারিবর্ণের সম্মেলন অপরিহার্য বিবেচিত হয়। নীচ যাদের বলি, তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি দিয়ে যে প্রাণীপূজা করতেন, পুরাণের কাহিনীতে সেইগুলিকেই আত্মসাৎ করা হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ব্দ শুর সঙ্গে সঙ্গেই; যেমন, দূর্গা স্বর্ণগোধিকারূপে কালকেতুকে ছলনা করেছিলেন, সতীপীঠ বা শক্তিতীর্থে শিবা ভোগ দ্বারা মাতৃপূজা করা হয়, দশমীর দিন দূর্গা বাগ্দিনীবেশে মর্ত্যে মাছ ধরতে এসেছিলেন, দশমার দিন পান্তাভাতে চ্যাংমাছ পোড়া দিয়ে দেবীর ভোগ হয় - এটি মনসাপূজকদের প্রতি দূর্গার ভক্তদের অবমাননার প্রমাণ, দেবী শঙ্খচিল হ'য়ে মহাষ্টমীর ক্ষণে বলি দর্শন করতে আসেন। এরপর আছে মহাষ্টমীর বলির পর বহু গ্রামাঞ্চলে রক্তরঞ্জিত উত্তোলিত খড়্গহাতে তাণ্ডব নৃত্য, তার সঙ্গে সমবেত উচ্চকণ্ঠের গান —
ও মা দিগম্বরী নাচ গো, শ্যামা রণ মাঝে।
যেমন নাচ শিবের কাছে তেমনি নাচ আমার কাছে — মা গো।
ভৈরবী ভবানীভক্ত কটরাপূরায়ে রক্ত — মা গো।
এবারে এসেছ ভবে আবার যে মা আসতে হবে — মা গো।
নাচ গো নাচ গো শ্যামা নাচ গো — শ্যামা রণ মাঝে।
এ গানে দূর্গা-শ্যামা এক হ'য়ে গেছে। শক্তিপূজার এই পৈশাচিক রূপ মহাপ্রভুকে ব্যথিত করেছিল। তিনি বৈষ্ণবতার প্রেমের আদর্শে সারা জাতিকে দীক্ষা দিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু দূর্গাপূজায়, বিশেষত পারিবারিক পূজাগুলিতে বলিবিধি আজও অব্যাহত। কোথাও কোথাও মানসিক পরিশোধ জোড়াপাঁঠা এবং বহুবলি রেওয়াজ আছে। কোন শুভ কামনায় পশুরক্তদান আদিম বিশ্বাস। প্রাগার্য যুগ হ'তে অরণ্যপর্বতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী পশুবধ ক'রে এসেছে। দেবপূজায় পঞ্চরিপুর প্রতীক পশু পাঁচটি পশু বা ফলশস্যাদি বলির রীতি মানুষের ধর্মীয় মূঢ়তা ছাড়া কিছুই নয়।

কোন কোন স্থানে সপ্তমীর দিন দেবীর ঘট ভরার সময় শূকর বলি ক'রে সুরথের ভাবাদর্শে কোলাধবংস করা হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে হিংলাজে, স্বয়ম্ভুশিবতীর্থ অমরনাথে পুরোহিত এবং পূজাধিকারীগণ আজও মুসলমান। বহু মুসলিম পরিবার আজও কালীপূজার খরচ ও উপকরণ সরবরাহ করেন, শিবের হোম হয় একাধিক মুসলিম পরিবারের তত্ত্বাবধানে, শিবের মাথায় শিবরাত্রিতে দুধ ঢালার প্রয়োজনীয় দুধও আসে এই পরিবার হতে — অথচ সারা বিশ্বের ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধের অধিকাংশই হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গেই বিপরীতে কোথাও হিন্দু, কোথাও বৌদ্ধ বা জৈন আবার কোথাও ইহুদী। সুতরাং শূকর বলি দ্বারা দূর্গার ঘট নিয়ে যাওয়ার রাস্তায় মুসলিম অনুপ্রবেশ বন্ধকরার রীতি নিশ্চয়ই প্রাচীন পদ্ধতি নয়। এসব বিচারেই মনে হয় দূর্গামূর্তি, তাঁর পূজামন্ত্র, উপকরণ সুপ্রাচীন কোন সভ্যজাতির দান নয়।

দূর্গাপূজার ষোড়শোপচার মধ্যে 'বারাঙ্গনা দ্বারমৃত্তিকা' লাগে। বেশ্যাবাড়ির মাটি দিয়ে পরমাপ্রকৃতির পূজা — এযে ধর্মীয় ব্যাভিচার। অথচ বেশ্যাসমান সতী নাই, কেন না এঁরা আপন দেহের শুচিতা বিসর্জন দিয়ে বহু রমণীর সতীত্ব রক্ষা করেন। তাছাড়া পঞ্চম'কার সাধনায় এঁরাই ভৈরবী, এই সভ্যতার ছিন্নমস্তা। আর এক কথা কোন মৃত ব্যক্তির মূর্তি যখন তৈরী হয় তখন সামনে পিছনে সমান যত্ন নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্গাদি প্রতিমা নিছকই কল্পনা বুঝি যখন দেখি সামনে সুসজ্জিতা প্রতিমাখানির পিছনে খড়-বাতা-সুতলী ঝুলছে। এ প্রতিমা একাদশ শতকের বাঙালী মুনি মর্কণ্ডের ধ্যানের ধন, বাঙালী ক্ষত্রিয় সুরথ এবং বাঙালী বৈশ্য সমাধির হাতে প্রথম পূজিতা; কিন্তু মূল পূজা আদিম জাতি ও কৌমগুলির শস্য এবং পশুপাখী পূজাতেই লুক্কায়িত। পুরোহিতের অশুদ্ধ উচ্চারিত মন্ত্র, না বুঝে নির্মিত ধ্যান বর্হিভূত প্রতিমা, না জেনে করা অর্থহীন ধর্মকৃত্যাদি অতিরিক্ত সংযোজন, যার দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই হয় বৎসরের পর বৎসর।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com